ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

দুই পর্ব একত্রে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

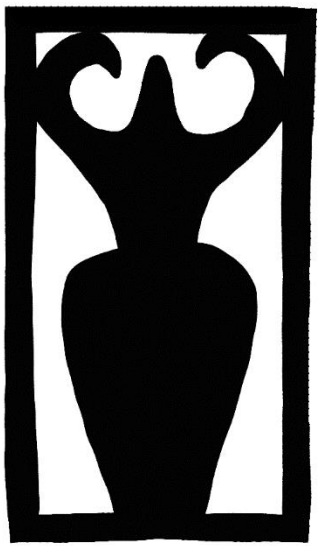

KOBI PROKASHANI

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা
দুই পর্ব একত্রে
রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৬০০ টাকা

VOLGA THEKE GANGA [Dui Parba Ekatre] Bengali Translations of Rahula Sankrityayan's Hindi Original *Volga se Ganga and Kanaila ki Katha* Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 600 Taka RS: 600 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99841-0-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

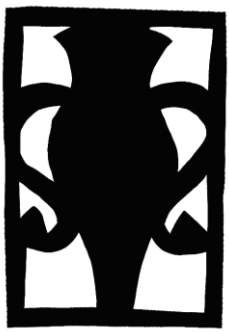

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

ভূমিকা	৯
বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে	১১
লেখকের প্রতিকৃত	১৪
নিশা	১৫
দিবা	২৭
অমৃতাশ্ব	৪০
পুরুহূত	৫১
পুরুধান	৬৬
অঙ্গিরা	৭৪
সুদাস	৮৮
প্রবাহণ	১০২
বন্ধুল মল্ল	১১৪
নাগদত্ত	১২৮
প্রভা	১৪৫
সুপর্ণ যৌধেয়	১৬৭
দুর্মুখ	১৮১
চক্রপাণি	১৯৩
বাবা নূরদীন	২০৬
সুরৈয়া	২১৯
রেখা ভগৎ	২৩২
মঙ্গল সিংহ	২৪৫
সফ্‌দর	২৫৯
সুমের	২৭৪

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা (দ্বিতীয় পর্ব)

কনৈলা	২৮৯
আর্যজাতির উপনিবেশ	২৯৬
শিংশপা	৩০৪
দেবপুত্র	৩১২
জিনদাস	৩১৬
শ্রীকর	৩২৬
মুসলিম বিজয়	৩৩৬
মহাবিদ্রোহ	৩৫৪
স্বরাজ	৩৬৩

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা

ভোল্‌গা সে গঙ্গা

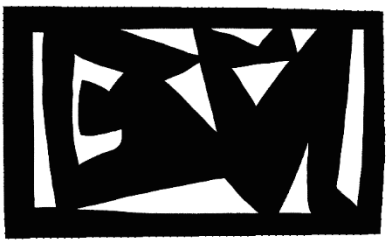

অনুবাদকমণ্ডলী
অসিত সেন, সুধীর দাস এবং মৃণাল চৌধুরী

ভূমিকা

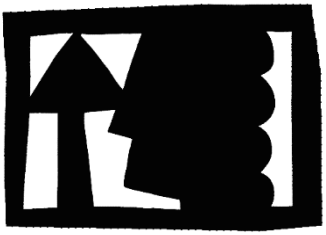

প্রথম সংস্করণ

মানবসমাজ আজ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে সেখানে পৌঁছাতে প্রারম্ভিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত বড় বড় সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। আমার লেখা 'মানব-সমাজ' গ্রন্থে মানবসমাজ প্রগতি সংক্রান্ত বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছি। বিষয়টি সহজভাবেও লেখা যায় যাতে প্রগতির ধারা অনায়াসেই বুঝে নেওয়া সম্ভব। সেই কারণেই 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার জন্য আলোচ্য গ্রন্থে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি। মিশরীয়, সিরিয়ানী বা সিন্ধুজাতির বিকাশ ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সহস্রাধিক বছর আগে ঘটে গেছে। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে লেখক-পাঠক উভয়েরই বিস্তর ঝামেলা।

প্রত্যেক যুগের একটি করে প্রামাণিক দলিল চিত্রণে প্রয়াসী হয়েছি। তবে প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি আমার প্রয়াস আগামী দিনের লেখকের ত্রুটিহীন রচনার সহায়ক হয় তবে নিজেকে সার্থক মনে করব।

সেন্ট্রাল জেল, হাজারীবাগ
২৩.৩.১৯৪২

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

দ্বিতীয় সংস্করণ

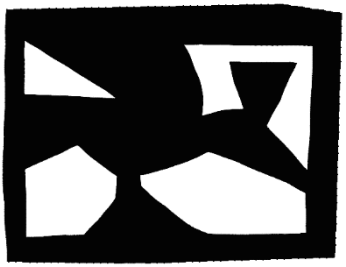

সাত-আট মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া লেখকের খুশি হবার মতো ব্যাপার কিন্তু তার চাইতেও সন্তোষজনক ব্যাপার হলো—সনাতনপন্থী জ্ঞানপাপীদের অসংযত রচনামৃত, যেগুলো কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে গালি-গালাজের মাধ্যমে। জনাকয়েক সজ্জন সংযমরক্ষার ব্যর্থপ্রয়াসে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় নেমেছেন। তাঁরা আশা করে বসে আছেন যে, বর্তমান লেখক তাঁদের লেখার প্রতিবাদ জানাতে কলম ধরবেন। যদিও উক্ত সমালোচকদের বিরামহীন লেখনীকে অচল করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও দু-একটি কথা জবাব হিসাবে জানাতে হচ্ছে।

এই গ্রন্থের প্রতিটি কাহিনির পৃষ্ঠপটে রয়েছে প্রাসঙ্গিক যুগ সম্পর্কিত গুরুত্ববাহী বস্তুনিচয়, যার তালিকায় আছে—দুনিয়ার কতই না ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, মাটি-পাথর-তামা-পেতল লোহার ওপর খোদাই করা সাংকেতিক লিপি অথবা সাহিত্য এবং অলিখিত গীত-কাহিনি-রীতি-রেওয়াজ...ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রন্থ-রচনাকালে লেখকের ইচ্ছা ছিল এবং যে-ইচ্ছা এখনও সজীব তা হলো গৃহীত তথ্যপ্রমাণের প্রামাণিকতা গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজন করার। কিন্তু ওই পরিকল্পনার ব্যাপকতা ও বিশালতা এবং সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অপ্রতুলতার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে। এ ধরনের বইতে মামুলি একটা পরিশিষ্ট জুড়ে দিলেই দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আর এটাও মনে হয়েছে, ওই ধরনের পরিশিষ্টের কলেবর মূল গ্রন্থের আয়তনের তুলনায় অনেক বড় হবে। বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তন করা হয়েছে যৎসামান্য, এক ঝলকে কোনো রকমে কাজ সেরে নিয়েছি। ইচ্ছে ছিল, প্রতিটি কাহিনির সঙ্গে একটি রঙিন চিত্র দেবার কিন্তু যুদ্ধকালীন দুঃসময়ে সেটাও সম্ভব হলো না।

কিতাব মহল
প্রয়াগ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে

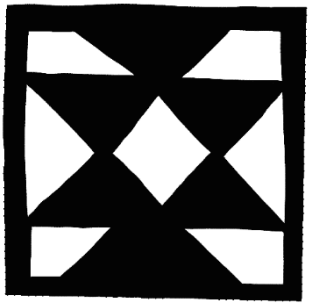

বন্ধুবর রাহুল সাংকৃত্যায়নের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি গ্রন্থ 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা' প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বহির্ভারতেও ইংরাজি, বর্মী ভাষায় এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

'ভোল্‌গা সে গঙ্গা' গ্রন্থখানির প্রথম আবেদন এর আখ্যানবস্তু। সমগ্র গ্রন্থটি ছোট ছোট গল্প বা কাহিনি আকারে লেখা কিন্তু এই কাহিনি বা আখ্যানের পিছনে একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। সে ব্যাখ্যা বিরাট পটভূমিকার ওপর ঐতিহাসিক সত্য বস্তুর। প্রায় ছয় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ কালে ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিমে দক্ষিণ-বাহিনী ভোল্‌গার তীরে অরণ্যতুষারসমাচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানবগোষ্ঠীর পদপাত শোনা গিয়াছিল, তাঁদেরই আবাস, জীবন, প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে এ মহাগ্রন্থের প্রথম দৃশ্যপট উত্তোলিত হয়। তারপর সেই মানুষ ক্রমে মধ্য ভোল্‌গা তটে অগ্রসর হয়ে এলো, তার সমাজ বিকাশিত হয়ে উঠল, ক্রমে ক্রমে তার ভাষাও বিন্যস্ত হয়ে এলো। ক্রমে এই হিন্দি-শ্লাভ ভাষাভাষী মানুষ আরও অগ্রসর হলে এলো, তরঙ্গের পর তরঙ্গে তারা মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে গেল—পামীর, উত্তর কুরুতে তাদের বসতি হলো, এবার জন্ম হলো হিন্দি-ইরানীয় ভাষার। ক্রমে তারা স্বাত উপত্যকায় পৌঁছে গেল, এবার সারা গান্ধার জুড়ে তাদের আবাস—হিন্দু-আর্য ভাষা তখন জন্ম নিয়েছে, সম্ভবত সেখানেই ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ক্রমে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে এই আর্যদের বসতি স্থাপিত হয়েছে।

এইভাবে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে কাহিনির পর কাহিনিতে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থের কাহিনিগুলো কাহিনি হলেও নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে রচিত হয়েছে। তাই ইতিহাস আর সমাজ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে কোথাও এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। কাহিনিতে কায়ালাভ করে ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই আরও বাস্তব ও সজীব হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি গল্পচ্ছলে অনুধাবন করার পক্ষে সুবিধাজনক, তাই এ গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য।

'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র প্রথম কয়েকটি কাহিনিতে বাস্তব তথ্য-প্রমাণের স্বাভাবিক অপ্রতুলতা রয়েছে কারণ ভোল্‌গা থেকে মানবের প্রাচীন গোষ্ঠীসমূহের ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে পৌঁছাবার সময়টা প্রাগৈতিহাসিক। নিশা, দিবা, অমৃতাশ্ব, পুরুহুত প্রভৃতি রচনায় রাহুল প্রধানত লুইস মর্গানের 'এনসেন্ট সোসাইটি', এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', রবার্ট ব্রিফলের 'দি মাদার্স' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানীদের অনুমোদিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছেন, তবে এখানেও তাঁর স্বকীয়তা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো এ কথা সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা-লেখকও বহুতর ক্ষেত্রে রাহুলের মতামতকে সম্পূর্ণত স্বীকার করেন না—তার জন্য, যে উপায় এবং যে দৃষ্টি নিয়ে রাহুল এই সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক কাল অধ্যয়ন করেছেন তার মূল্য তুচ্ছ হতে পারে না।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনিগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের—পুরুধান থেকে প্রবাহণ পর্যন্ত কাহিনিগুলিতে রাহুল বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ ও বৌদ্ধভাষ্য, অট্‌ঠ কথার সাহায্য নিয়েছেন। এর মধ্যে সুদাস সম্পূর্ণভাবে ঋগ্বেদের ওপর নির্ভর করে লেখা। প্রবাহণের আধার ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও তার সঙ্গে অট্‌ঠ কথা। এই অংশে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর থেকে সাতশ খ্রিস্টপূর্ব বৎসর পর্যন্ত তেরোশ বছরের বর্ণনা রয়েছে।

তারপর পাঁচশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে গুপ্তযুগের প্রাক্কাল অবধি কাহিনিগুলোর মোটামুটি আধার হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ এই কটি গ্রন্থ—এ ছাড়া বিভিন্ন গ্রিক পর্যটকের ভ্রমণকথা, জয়সওয়াল-এর 'হিন্দু পলিটি' ও অন্যান্য ইতিহাস। তদুপরি প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক, উইন্টারনিট্‌জের 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস', রিজ্ ডেভিজ-এর 'বৌদ্ধ ভারত' এ পর্যায়ের কাহিনি রচনায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। এর পর সুপর্ণ যৌধেয় কাহিনিতে এসে গুপ্তযুগের বিবরণ পাওয়া গেল—এর বহু বিবরণ গুপ্তযুগের পুরালেখসমূহ হতে আহৃত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানম্-শকুন্তলম্ থেকেই গৃহীত, তা ছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তও কাজে লেগেছে।

এর পরের আখ্যান দুর্মুখ মূলত হর্ষচরিত, কাদম্বরী এবং হি উয়েন-সাঙ এবং ইৎসিঙ-এর বিবরণাদির ওপর নির্ভরশীল, তেমনি চক্রপাণির ঐতিহাসিকতারও

মোটামুটি প্রমাণ নৈষধ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু লেখমালা। তারপর নূরদীন থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার নিদর্শন আরও স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, এ গ্রন্থের অধিকাংশ আখ্যানের পাত্রপাত্রীই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পূর্বাপর ঐতিহাসিক সময়সূত্রে গ্রথিত।

সর্বশেষে মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ করার জন্য বন্ধুবর শ্রী সুধীর দাস ও শ্রীমান অসিত সেন যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট নয় তাঁদের সফলতাকেও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। আশা করি, অন্যান্য ভাষায় 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র অনুবাদ যেরূপ সমাদর লাভ করেছে, বঙ্গানুবাদেও ততটা বা তার চেয়ে বেশি সমাদর লাভ করবে। এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রী সুবোধচন্দ্র চৌধুরী, শ্রী কমল সরকার এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের সাহায্য এবং সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিমধিকমিতি—

শ্রী মহাদেবপ্রসাদ সাহা

১ বৈশাখ, ১৩৬১
স্বাধীনতা কার্যালয়
কলকাতা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(৯.৪.১৮৯৩ - ১৪.৪.১৯৬৩)

নিশা

দেশ : ভোল্‌গা নদীর তীর।। কাল : ৬০০০ খ্রিস্টপূর্ব

বেলা দ্বিপ্রহর, অনেক দিন পরে আজ সূর্যের দেখা পাওয়া গেল। এখন দিনগুলি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তবুও এ সময় রৌদ্রের তীব্রতা নেই; মেঘঝঞ্ঝাহীন, তুষার ও কুয়াশামুক্ত সূর্যের সুদূরবিস্তারী কিরণ দেখতে মনোহর—তার স্পর্শ এক আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে। আর চারদিকের দৃশ্য? ঘন নীল আকাশের নিচে পৃথিবী রয়েছে কর্পূরের মতো সাদা তুষারে ঢাকা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর তুষারপাত না হওয়ার জন্য পূর্বের দানা-দানা তুষারকণাগুলি কঠিন জমাট হয়ে গেছে। এই হিমবসনা ধরিত্রী দিগন্তপ্রসারী নয়, বরং উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে গিয়েছে আঁকাবাঁকা রুপালি রেখার মতো, যার দুধারে পাহাড়ের ওপর নিবিড় অরণ্যরেখা। আসুন, এই বনরাজিকে আরও কাছে গিয়ে দেখি। এই তরুশ্রেণির মধ্যে মূলত দুই ধরনের বৃক্ষাদি আছে। একটির নাম ভূর্জ—শ্বেত বল্কলধারী এবং বর্তমানে নিষ্পত্র; অপরটি পাইন—উত্তুঙ্গ ও ঋজু। শাখাগুলি সমকোণে ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। সূচ্যগ্র পাতাগুলি হরিৎ বর্ণ—কোনোটা ঘন গাঢ় সবুজ আর কোনোটা ফিকে। তুষারের অজস্র দান থেকে গাছগুলি নিষ্কৃত পায়নি, গাছের কোণে তুষারের স্তূপ সাদা কালোর রূপ-রেখা সৃষ্টি করে কার যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে! এ ছাড়া চারদিকে ভয়ংকর নীরবতার অখণ্ড রাজত্ব বিদ্যমান। কোনোদিক থেকেই শোনা যায় না ঝিঁঝির ঝংকার, পাখির কাকলী বা পশুর কোলাহল।

আসুন, পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরস্থিত পাইন গাছের ওপর উঠে চারদিকটা দেখি। হয়তো ওখানে গেলে বরফ, জমি ও পাইন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। বড় বড় বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে মনে হতে পারে যে এখানে কি কেবল এই

রকম গাছই জন্মায়? এই জমিতে কি ছোট ছোট চারা গাছ বা ঘাস জন্মায় না? কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কোনো মতামত দিতে পারি না। শীত প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলি কতখানি বরফের স্তূপে ঢাকা পড়েছে তা বলা শক্ত, আমাদের কাছে মাপবার কিছু নেই। এই বরফের স্তূপ আট হাত অথবা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। বরফ এ বছর বেশি পড়েছে—এ অভিযোগ সকলেরই।

পাইনের ওপরে এসে কী দেখা যাচ্ছে? দেখছি সেই বরফ, সেই বনরাজি আর সেই উঁচু-নিচু পার্বত্য-ভূমি। হ্যাঁ, পাহাড়ের অপর পারে এক জায়গায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। জনপ্রাণী-শব্দশূন্য বনভূমির মধ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। আসুন ওখানে গিয়ে নিজেদের কৌতূহল মিটিয়ে আসি।

ধোঁয়া অনেক দূর। স্বচ্ছ মেঘশূন্য আকাশের পটভূমিতে কত কাছেই না মনে হচ্ছিল। যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে আমরা তার কাছে পৌঁছে গেছি, গন্ধ পাচ্ছি আগুনে পোড়া চর্বি আর মাংসের। শব্দও শোনা যাচ্ছে—শোনা যাচ্ছে শিশুদের কলরব। আমাদের খুব সাবধানে শ্বাস বন্ধ করে পা টিপে টিপে যেতে হবে। না হলে ওরা জানতে পারবে! জানতে পারলে—কে জানে, ওরা কিংবা ওদের কুকুরগুলো কী রকম অভ্যর্থনা করবে!

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই ছোট ছোট শিশুরা রয়েছে—এক থেকে আট বছরের মধ্যে এদের বয়স! একটি ঘরের মধ্যে জনা ছয়েক ছোট ছেলেমেয়ে। একে ঠিক ঘর বলা চলে না—স্বাভাবিক পর্বতগুহা মাত্র। এই গুহাগৃহের পাশে ও পেছনে কতদূর পর্যন্ত অন্ধকার বিস্তৃত জানি না, আর জানার চেষ্টা করাও উচিত নয়। পূর্ণবয়স্ক একটি বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছে—তার জটাধরা ধোঁয়াটে শনের মতো সাদা চুলগুলি এলোমেলোভাবে মুখে এসে পড়ছে। বুড়ি হাত দিয়ে মাঝে মাঝে মুখ থেকে সেগুলি সরিয়ে দিচ্ছে। ভুরুর চুলগুলিও পেকে সাদা রঙ ধরেছে। সাদা মুখের চামড়া কুঁচকে জায়গায় জায়গায় ঝুলে পড়েছে, গুহার ভেতরে আগুনের তাপ ও ধোঁয়া দুই আছে—বিশেষ করে যেখানে আছে শিশুগুলি ও তাদের দিদিমা। মাতামহীর দেহে কোনো আবরণ নেই, নেই কোনো কাপড়-চোপড়ের বালাই! শীর্ণ কঙ্কালসার হাত দুটি পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে, চোখ কোটরাগত, ফিকে নীল চোখের দুটি তারা জ্যোতিহীন, কিন্তু মাঝে মাঝে ঝকমক করে ওঠে, এতে মনে হয় সেগুলি এখনও একেবারে নিষ্প্রভ হয়নি। কান দুটি তো খুবই সজাগ। মনে হচ্ছে দিদিমা যেন শিশুদের কথা মন দিয়ে শুনছে। এইমাত্র একটি শিশু চিৎকার করে উঠল, দিদিমা সেদিকে তাকাল। এক বছর ও দেড় বছরের দুটি শিশু, মাথায় দুজনেই সমান। দুজনেরই চুল পিঙ্গল বর্ণ। এদের চুলের রঙ বৃদ্ধার চেয়ে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল। এদের নধরকান্তি দেহ, দুধে আলতায় রঙ, বড় চোখ, ঘন নীল তারা। ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে চুষিকাঠির মতো একটি ছোট হাড় চুষছে।

দিদিমা কম্পিত স্বরে ডাকল, 'অগিন! আয়। এখানে আয় অগিন! এই যে তোর দিদি এখানে।'

অগিন উঠল না। একটি বছর আটেকের ছেলে এসে অগিনকে কোলে করে মাতামহীর কাছে নিয়ে গেল। এই ছেলেটিরও চুল অন্যদের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণাভ তবে কিছু বেশি লম্বা এবং জট পাকানো। দেহের বর্ণ গৌর, তবে শিশুদের মতো পরিপুষ্ট নয়। গায়ের এখানে ওখানে ময়লা জমে আছে। ছেলেটি ছোট শিশুটিকে এনে মাতামহীর কাছে দাঁড় করিয়ে বলল, 'দাদী! রোচনা হাড় কেড়ে নিয়েছে, অগিন তাই কাঁদছে।'

ছেলেটি এই বলে চলে গেল। মাতামহী তার শীর্ণ হাতে শিশুটিকে তুলে নিল। অগিন তখনও কাঁদছিল। তার চোখের জলের ধারায় গালের ময়লা কেটে গিয়েছে, সেখানে উঁকি মারছে গৌরবর্ণের ওপরে সোনালি রেখা। মাতামহী অগিনের মুখে একটি চুমু খেয়ে বলল, 'অগিন! কেঁদো না, আমি রোচনাকে মারছি।'

এই বলে মাতামহী খালি হাতটা চর্বিমাখা মাটির ওপর আঘাত করল। অগিনের কান্না তখনও থামেনি, চোখের জলও ফুরোয়নি। মাতামহী তার ময়লা হাত দিয়ে অগিনের মুখ মুছিয়ে দিলে—তার হাতের ময়লাতে শিশুর রক্তাভ গাল কালো হয়ে গেল। অগিনকে শান্ত করার জন্য মাতামহী তার নিজের শুকনো স্তনটি মুখে তুলে দিল। অগিনের কান্না বন্ধ হলো, সে মাতামহীর স্তন চুষতে লাগল। এই সময় বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। শিশুটি শুকনো স্তন ছেড়ে সেইদিকে তাকাল।

কার যেন মিষ্টি গলার স্বর—'অ-গি-ই-ন!'

অগিন আবার কেঁদে উঠল। দুটি স্ত্রীলোক একটি কোণের দিকে তাদের মাথা থেকে কাঠের বোঝা ফেলে একজন রোচনার কাছে অপরজন অগিনের কাছে ছুটে গেল। ক্রন্দনরত অগিন আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল 'মা' 'মা' বলে। মা তার ডান হাতকে খালি রেখে ডানদিকের স্তনের ওপর থেকে লোমযুক্ত বলদের চামড়ার আবরণটি খুলে ফেলল। শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া ভালো নেই বলে তরুণীর দেহ যথেষ্ট মাংসল নয়, কিন্তু সৌন্দর্য অসাধারণ। ময়লাহীন আরক্তিম গালের উজ্জ্বল আভা, জটাবিহীন সোনালি কেশদাম, তন্বী দেহ, পরিপুষ্ট বুকের ওপর গোল গোল শ্যামল-মুখ স্তন, কৃশ কটি, আকর্ষণীয় নিতম্ব, পরিপুষ্ট পেশল জানু, পরিশ্রমে গড়ে ওঠা পায়ের ডিম। সেই অষ্টাদশী তরুণী অগিনকে দুহাতে তুলে তার মুখ চোখ গাল অসজ্র চুমুতে ভরে দিল। অগিন কান্না ভুলে গেল। তার দুটি রক্তাভ ঠোঁটের আড়ালে কচি দাঁতগুলি চিকচিক করছে, চোখ দুটি আধ-বোজা, গালে টোল পড়েছে। একটি বৃষভ-চর্মের ওপরে বসে তরুণী তার কোমল স্তনটি তুলে দিল অগিনের মুখে। এই সময় অপর তরুণীটিও রোচনাকে নিয়ে তার কাছে উপবেশন করল, দেখলেই বোঝা যায় ওরা দুজন সহোদরা।

২

গুহার মধ্যে এদের নিভৃত গল্প-গুঞ্জনে ব্যস্ত রেখে আমরা বাইরে এসে দেখছি বরফের ওপর চামড়ার আবরণে আচ্ছাদিত অনেকগুলি পায়ের চিহ্ন। আসুন,

আমরা ওদের এই পদচিহ্ন দ্রুত অনুসরণ করি। পায়ের সারি গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের ওপাশের জঙ্গলে। আমরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু চলমান পায়ের রেখা বহন করে নিয়ে চলেছে টাটকা পায়ের ছাপ। আর—আমরা চলেছি শুভ্র তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করে, আবার কখনো বা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এসে পড়েছি অন্য কোনো হিমক্ষেত্রে—সর্বশেষে আমাদের নজর পড়ল একটি বৃক্ষলতাহীন পাহাড়ের ওপরে। এখানে নিচে থেকে ওঠা শুভ্র হিমরাশি গিয়ে মিশেছে নীল নভোমণ্ডলে—আর নীলাকাশের পটভূমিতে মানবমূর্তি দেখা যাচ্ছে, এই মানুষের সারি গিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে পাহাড়ের প্রান্তে। মূর্তিগুলির পেছনে যদি নীলাকাশ না থাকত তাহলে আমরা কিছুতেই মানুষগুলিকে দেখতে পেতাম না। ওদের শরীর ঢাকা আছে বরফের মতোই সাদা বৃষচর্মে; তাদের হাতের অস্ত্রগুলিও যেন ধবধবে সাদা। এই পরিব্যাপ্ত শ্বেত তুষারের ক্ষেত্রে আন্দোলিত মূর্তিগুলিকে ঠিক করে চিনে ওঠা দায়!

আরও কাছে গিয়ে দেখা যাক। সবার আগে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক, বলিষ্ঠ তার দেহ—বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যে। তার নগ্ন দক্ষিণ বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে খুব বলবতী। মাথার চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি আমাদের গুহায় দেখা পূর্বোক্ত তরুণীদ্বয়ের মতোই—তবে আকারে বড়। বাঁ হাতে একটি ছুঁচলো তিন হাত লম্বা ভূর্জ গাছের মোটা কাঠ। ডান হাতে কাঠের হাতলে দড়ি দিয়ে বাঁধা পাথরের কুঠার, শিকারের জন্য ঘষে ঘষে শাণ দেওয়া হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে চারজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক। একজন পুরুষের বয়স মেয়েটির চেয়ে কিছু বেশি, আর বাকি সকলেই চৌদ্দ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। বয়স্ক পুরুষটির মাথার চুল লম্বা এবং রঙ আর সকলের মতো স্বর্ণাভ-শুভ্র, সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা। পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মতো শরীরের গঠন বলিষ্ঠ এবং তারও কাছে স্ত্রীলোকটির মতোই দুটি অস্ত্র আছে। বাকি তিনজন পুরুষের মধ্যে দুজনের মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, কিন্তু বয়স কম। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একজনের বয়স বাইশ অপরজন ষোড়শী—হয়তো বা আরও কম। আমরা আগের গুহায় মাতামহীকে দেখেছি। এদের সকলকে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা সকলেই একই ছাঁচে গড়া। হাতে কাঠ, হাড় ও পাথরের অস্ত্রাদি এবং তাদের অভিযান দেখে মনে হয়, তারা যেন যুদ্ধে যাচ্ছে।

পাহাড় থেকে নামার পথে প্রথম স্ত্রীলোকটি হচ্ছে মা। সে বাঁ দিকে ঘুরল, আর সকলে তাকে নীরবে অনুসরণ করল। বরফের ওপর দিয়ে চলার সময় তাদের চামড়ায় ঢাকা পায়ের কোনো শব্দ হচ্ছিল না। সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া একটি পাহাড়—তার চারপাশে কতগুলি ঢিলা। শিকারিরা এবার তাদের গতি একেবারে কমিয়ে দিল। তারা সতর্কতার সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর অতি ধীরে সন্তর্পণে দূরে দূরে পায়ের পাতা ফেলে টিলার দিকে এগোতে লাগল। মা সকলের আগে গুহামুখে গিয়ে পৌঁছাল। গুহার বাইরের সাদা বরফের দিকে ভালো করে তাকাল—সেখানে কোনো কিছুর পায়ের চিহ্ন পড়েছে কি না? দেখল কোনো চিহ্ন

নেই। সে একলাই গুহার মধ্যে প্রবেশ করল; কয়েক পা এগিয়ে গুহার একটি বাঁক দেখা গেল, আলো খুবই কম। কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারকে চোখ-সওয়া করে নিল, তারপর এগোল। সেখানে দেখতে পেল, তিনটি ধূসর রঙের ভাল্লুক—বাবা, মা ও তাদের বাচ্চা নিচের দিকে মুখ করে নিশ্চলভাবে পড়ে আছে—মরে গিয়েছে কি না অনুমান করা যায় না। জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মা পা টিপে টিপে ফিরে এলো। মায়ের উৎফুল্ল মুখ দেখে পরিবারের আর সকলেই ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝে নিল। বুড়ো ও কড়ে আঙুল চেপে মা তিনটি আঙুল তুলে দেখাল। তারপর মা গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। অস্ত্রাদি বাগিয়ে তার পিছনে চলল দুজন পুরুষ। বাকি সবাই দমবন্ধ করে সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। গুহার মধ্যে গিয়ে মা দাঁড়াল মরদ ভাল্লুকটির কাছে, আর দুজন পুরুষের মধ্যে একজন মাদী ভাল্লুকটির কাছে, অপরজন বাচ্চাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজনে একই সঙ্গে ভাল্লুকের উদরে সুতীক্ষ্ণ কাঠের বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জখম করল। জন্তুগুলো আর নড়চড়া করবার অবসর পেল না, তাদের শীতকালের ছ'মাস নিদ্রাভঙ্গের তখনও একমাস বাকি। কিন্তু শিকারিদের পক্ষে তখন তা জানার উপায় ছিল না। তাদের তাই সতর্ক হয়েই কাজ করতে হয়। ডাণ্ডার তীক্ষ্ণ ফলাটি আরও তিন-চারবার সজোরে আঘাত করে ভাল্লুকগুলিকে উল্টে দিল। তারপর নির্ভয়ে ভাল্লুক তিনটির পা ও মুখ ধরে বাইরে টেনে আনল। সকলেই খুশি হয়েছে, এতক্ষণে, তাদের প্রাণ-খোলা হাসি ও গলা-ছেড়ে চিৎকার শোনা গেল।

বড় ভাল্লুকটিকে চিত করে ফেলে মা চকমকি পাথরের ছুরিটা চামড়ার পোশাক থেকে বার করে পুনরায় ভাল্লুকটির প্রথম আঘাত স্থানের ক্ষত থেকে শুরু করে পেটের চামড়াটা চিরে ফেলল। পাথরের ছুরি দিয়ে এত পরিষ্কারভাবে চামড়া চেরা খুবই অভ্যস্ত ও মজবুত হাতের কাজ। তারপর মা নরম হৃৎপিণ্ড থেকে একখণ্ড মেটে কেটে নিজের মুখে পুরল এবং আর একখণ্ড সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটির মুখে দিল। সবাই ভাল্লুকটির চারদিকে ঘিরে বসল আর মা তাদের সবাইকে কলিজার মাংস খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভাগ করে দিতে লাগল। একটি ভাল্লুকের মেটে খাওয়া শেষ করে অন্যটির কলিজা কাটবার জন্য যখন উদ্যোগ করছিল তখন দলের ষোলো বছরের মেয়েটি বাইরে এসে একখণ্ড বরফ মুখে পুরে দিল; এই সময় দলের প্রবীণ পুরুষটিও বেরিয়ে এসে বরফের টুকরো তুলে মুখে দিল এবং ষোড়শী মেয়েটির হাত চেপে ধরল। মেয়েটি প্রথমটা একটু ইতস্তত করে শান্ত হলো। পুরুষটি তাকে বাহুবেষ্টিত করে এক পাশে চলে গেল। এরা দুজনে যখন হাত-ভর্তি বরফকণা নিয়ে কাটা ভাল্লুকের কাছে ফিরে এলো তখন তাদের চোখ মুখের রঙ উজ্জ্বল, গাল রক্তিমাভ।

পুরুষটি বলল, 'এবার দাও আমি কাটি, তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।'

মা তার হাতে ছুরিটি তুলে দিল। তারপর একটু নত হয়ে পাশে উপবিষ্ট চব্বিশ বছরের যুবকটির মুখে চুমু খেয়ে তার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

এরা সকলে মিলে তিনটি ভাল্লুকের মেটে খেয়ে ফেলল। চার মাসের অনাহারী নিদ্রিত ভাল্লুকগুলোর চর্বি বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে বাচ্চা ভাল্লুকটির মাংসই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল নরম ও উপাদেয়। তাই তার অনেকখানি মাংস এরা খেয়ে ফেলল। তারপর সবাই পাশাপাশি শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল।

এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা; মদ্দা ও মাদী ভাল্লুক দুটির চার পা চামড়ার দড়িতে বেঁধে লাঠিতে ঝুলিয়ে দুজন করে কাঁধে নিল, বাচ্চাটিকে কাঁধে নিল ষোড়শী তরুণী, পাথরের কুড়ুল হাতে নিয়ে মা আগে আগে চলল।

এইসব বন্য মানুষগুলির সময়ের হিসাব ছিল না, ঘড়ির কাঁটার কোনো জ্ঞান না থাকলেও এ ধারণা তাদের ছিল যে আজকের রাত চাঁদনী রাত হবে। তারা কিছুদূর যাবার পর সূর্য দিগন্তে অস্তমিত হলো বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু তখনও সূর্যাস্ত হয়নি—আরও কয়েক ঘণ্টা গোধূলির আলো রইল। সূর্যকিরণের শেষ গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতে না যেতে বিশ্বচরাচর শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ভরে গেল।

তাদের গুহাশ্রয় তখনও অনেক দূর। পথে চলতে চলতে মা হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে থমকে দাঁড়াল, কান পেতে কিছু শুনতে লাগল। ষোলো বছরের মেয়েটি ছাব্বিশ বছরের ছেলেটির কাছে গিয়ে বলল, 'গুর্র, গুর্র, বৃক্, বৃক্' অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

মা মেয়েটির কথা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'বহু বৃক্, বহু বৃক্' অনেক নেকড়ে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে মা আবার বলল, 'প্রস্তুত হও।'

শিকার মাটিতে রেখে সকলে নিজ নিজ হাতিয়ার শক্ত করে ধরল এবং প্রতি দুজনে পিঠে পিঠ দিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়াল; নিমেষের মধ্যে সাত-আটটি নেকড়ে বাঘের একটি দল লকলকে জিভ বার করে তাদের দিকে এগিয়ে এলো, তারা কাছে এসে গজরাতে গজরাতে চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। মানুষের হাতে কাঠের বর্শা ও পাথরের কুঠার দেখে নেকড়েগুলো তাদের আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগল। ইতোমধ্যে চক্রের মাঝখানের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটি তার লাঠির সঙ্গে বাঁধা কাঠের ফলক খুলে নিজের কোমরে বাঁধা শক্ত চামড়ার দড়ি কাঠে বেঁধে ধনুক তৈরি করে ফেলল। কে জানে কোথায় নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল ছুঁচলো পাষাণ ফলকের তির। সে চব্বিশ বছরের যুবকটির হাতে তির-ধনুক দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল চক্রের মধ্যস্থলে নিজের জায়গায়, আর নিজে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়াল। চব্বিশ বছরের যুবকটি তখন ধনুকের গুণকে আরও শক্ত করে বেঁধে নিল, তারপর তির ছুড়ে একটি নেকড়ের পেটে বিদ্ধ করল। নেকড়েটি গড়িয়ে পড়ে গেল, কিন্তু পরে নিজেকে সামলে নিলে আবার যখন মরিয়া হয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করছিল যুবকটির দ্বিতীয় তির গিয়ে লাগল—আঘাতটা হলো মারাত্মক। নেকড়েটাকে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অন্যগুলি তার